Islami Ain O Bichar
Vol. 15, Issue: 57
January-March, 2019

Book Review : গ্রন্থ পর্যালোচনা

আল- মুকাদ্দিমা : হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে ঝলমল করে চিত্ত

Golam Samdani Koraishi*

আল-মুকাদ্দিমা আল্লামা ইবনে খালদুনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। কিন্তু সাধারণভাবে যে কোনো সাহিত্যিক, শিল্পী ও গবেষকের শ্রেষ্ঠ কীর্তি বলতে যা বোঝায়, আল-মুকাদ্দিমা শুধু তা নয়; বরং তার চাইতেও অধিকতর মর্যাদার অধিকারী। বস্তুত মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতির ইতিহাসে এ এক নতুন দৃষ্টি এবং এমন এক দৃষ্টি, যার ফলে ইতিহাসের বহু চেনা-জানা-শোনা উপাদান যেমন অচেনা হয়ে যায়, তেমনি বহু অখ্যাত অবজ্ঞাত উপাদানও নতুন পরিচয়ের মর্যাদায় উজ্জ্বল হয়ে উঠে। এ দৃষ্টিই মূলত ইবনে খালদুনের ঐতিহাসিক অন্তর্দৃষ্টি এবং এ বিষয়ে তাঁর যেমন যথার্থ কোনো পূর্বসূরি নেই, তেমনি তার কোনো যথার্থ উত্তরসূরিও গড়ে উঠেনি। একান্তভাবে আধুনিককালে আমরা সমাজতত্ত্ব ও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের যে ধারার সাক্ষাৎ লাভ করি, তা হয়ত ইবনে খালদুনের অন্তর্দৃষ্টিকেই আরো সমৃদ্ধ আকারে উপস্থিত করেছে; কিন্তু একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, এ তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ খালদুনী অন্তর্দৃষ্টির প্রত্যক্ষ প্রভাবজাত নয়। কারণ যে বস্তুবাদী আবহ আজকের এ সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে উপস্থিত তা সর্বাংশে ইবনে খালদুনের সত্তায় বিস্তৃত ছিল না । তিনি তার অন্তর্দৃষ্টির সরল বাস্তবতা নিয়ে একান্তভাবেই ভাববাদী।

ইবনে খালদুনের জীবনকাল খ্রিষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী। এ সময়ে তাঁর জীবন পরিবেশে এক ধরনের সীমাবদ্ধতা বিরাজ করছিল। এজন্যই আমরা দেখতে পাই তিনি ইবনে রুশদের বিরোধিতা করেছেন এবং দার্শনিক জীবন চেতনায় তিনি বরং ইমাম গাজ্জালীর সাথে একাত্মতা অনুভব করার দিকে এগিয়ে গেছেন। এরই ফলশ্রুতি হিসেবে তিনি দর্শন ও কিমিয়াশাস্ত্রের অসারতা প্রতিপন্ন করতে সচেষ্ট হয়েছেন। তবু একথা সত্য যে,

* Golam Samdani Koraishi (5 April 1929 – 11 October 1991) was a Bangladeshi writer. He was given Independence Day Award posthumously in 2017 by the Government of Bangladesh. About him: https://bn.wikipedia.org/wiki/গোলাম_সামদানী_কোরায়শী

তিনি ইমাম গাজ্জালীর অনুসারী নন। এ ক্ষেত্রেও ইবনে খালদুন তার নিজস্ব বিশিষ্টতায় সমুজ্জ্বল। তদুপরি ইতিহাস বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তিনি যে বাস্তব কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন, তা তাঁর এ বিশিষ্টতাকে আরো সুদুর প্রসারী করে তুলেছে।

ইসলামী জগতে ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার ধারা একান্ত প্রাথমিক পর্যায়েই আরম্ভ হয়েছিল। এক্ষেত্রে গ্রিক ঐতিহ্যের সমৃদ্ধির কথা বাদ দিলে সমগ্র পৃথিবীতে মুসলিম মনীষার অবদান শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয়। ইবনে খালদুনের জীবনকাল পর্যন্ত ব্যাপক বিস্তৃতি সহকারে ইতিহাস রচনার এ ধারা অনুসৃত হয়ে এসেছিল। কিন্তু ইতিপূর্বে অন্য কেউ ইতিহাসের বাস্তবতাকে এমন বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বিশ্লেষণ করে দেখার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেননি। এমন কি গ্রিক ঐতিহ্যেও এর অনুপস্থিতি সমভাবে লক্ষণীয়। বস্তুত ইবনে খালদুনই সর্বপ্রথম এর প্রয়োজনীয়তাকে ভাষা দিয়েছেন। এর কারণ তাঁর সম্মুখে লীলায়িত বাস্তব জগৎ ও ঐতিহাসিক উপাদানের মধ্যে তিনি একটা প্রচণ্ড বিরোধ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি নিজে সক্রিয়ভাবে জীবন সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ে সে বিরোধিতাকে আরো গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। বলা বাহুল্য যে, তাঁর পূর্বসূরি বা সমকালীন আর কারোর মধ্যেই জীবন সংগ্রামের এ ব্যাপকতা ছিল না। এজন্য মনে হয়, এ বিরোধের উপলব্ধি - জীবনের এ বাস্তব অভিজ্ঞতা সবকিছু মিলিয়েই ইবনে খালদুনকে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট বক্তব্য উপস্থাপনে উৎসাহিত করেছে। বস্তুত তাঁর ইতিহাসের ভূমিকায় এ প্রকার বিরোধ ও অভিজ্ঞতার বিচিত্র পরিচয় বিদ্যমান ।

এক্ষেত্রে ভূমিকা বলতে আমরা তাঁর ইতিহাসের যথার্থ ভূমিকার প্রতিই ইঙ্গিত করেছি। কারণ 'আল-মুকাদ্দিমা' শব্দের অর্থ যদিও বা ভূমিকাই, তথাপি এ আল-মুকাদ্দিমা এবং আমাদের উদ্দিষ্ট সেই ভূমিকার মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। এ পার্থক্য বুঝবার জন্য আমাদেরকে তাঁর ইতিহাসের সমগ্র বিষয় পরিধি উল্লেখ করতে হবে। ইবনে খালদুন তাঁর ইতিহাসটিকে তিনটি গ্রন্থে ও সাতটি খণ্ডে বিভক্ত করেছেন। এ ব্যাপক পরিকল্পনার ভূমিকায় তিনি ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব, ঐতিহাসিকদের ভ্রান্তি, এর কারণ ও ফলশ্রুতি এবং তাঁর ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। মূলত তাঁর এ ভূমিকার বিবৃতি তেমন কিছু নয়; অবশ্য এর মধ্যেই তিনি তার অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। এরপর তিনি তার ইতিহাসের গ্রন্থে এ ভূমিকার পরিপূরক বিচিত্র বিষয় সন্নিবেশ করেছেন। মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতির সাথে সংশ্লিষ্ট ও তৎকালে প্রচলিত এমন কোনো বিষয় নেই, যা তিনি এতে সংগ্রহ করেননি। পর্যায়ক্রমিকভাবে বিন্যস্ত এ প্রকার প্রতিটি বিষয়কেই তিনি সমাজ প্রগতির সাথে সংশ্লিষ্ট করে এর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করে দেখবার

চেষ্টা করেছেন। এ কারণেই তার এ ব্যাপক সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ একদিকে গ্রন্থটিকে যেমন একটি বিশ্বকোষ জাতীয় রচনায় পরিণত করেছে, অন্যদিকে তেমনি এটি তাঁর ভূমিকারই বিষয় বিস্তার বলে পরিগণিত হয়েছে। এর ফলে শুধু বর্তমানে নয়, ইবনে খালদুনের জীবনকালেই তাঁর ভূমিকা ও প্রথম গ্রন্থ 'আল-মুকাদ্দিমা' বা ভূমিকা নামে পরিচিতি লাভ করে। ইবনে খালদুন স্বয়ং তাঁর আত্মজীবনীতেও আল-মুকাদ্দিমাকে এভাবে উল্লেখ করেছেন।

ইতোপূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি যে, ইবনে খালদুনের এ প্রথম গ্রন্থটি একটি বিশ্বকোষ জাতীয় রচনা। মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতির যে বিচিত্র উপাদানের আলোচনা তিনি এতে তুলে ধরেছেন, তার বিস্তারিত মূল্যায়ন এখানে সম্ভব নয়; তবু আমরা এর বিশেষ কয়টি দিক নিয়ে তার বিশিষ্টতার পরিচয় ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করব। এ প্রকার চেষ্টার সীমাবদ্ধতা সহজেই অনুমেয়।

ইবনে খালদুনের আল-মুকাদ্দিমায় প্রবেশ করলে যে বিষয়টি সর্বাপেক্ষা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে তা হল, তাঁর সামগ্রিক বিষয় বিন্যাসের কেন্দ্রবিন্দুরূপে মানুষের অধিষ্ঠান। বস্তুত মানুষের শ্রম ও চিন্তার ফসল রূপেই সভ্যতা-সংস্কৃতির বিচিত্র উপাদান গড়ে উঠেছে। প্রাকৃতিক পরিবেশের বিরূপতা ও সহায়তাই মানুষকে এ সকল উপাদান সৃষ্টির পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে। কারণ কোন একক মানুষের পক্ষে যেহেতু জীবনের সামগ্রিক চাহিদা মিটিয়ে টিকে থাকা সম্ভব নয়, সেজন্যই মানুষ স্বেচ্ছায় সমাজবদ্ধ জীবনযাপন করতে উৎসাহিত হয়েছে এবং পরস্পরের সহায়তায় জীবনের প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করে নিয়েছে।

অন্যদিকে মানুষের এ প্রকার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সামাজিক বিকাশ সর্বত্র সমানভাবে হয়নি। এর কারণ প্রকৃতির বিরূপতা। এ প্রসঙ্গে ইবনে খালদুন গ্রিক ও সমকালীন ঐতিহ্যকে আত্মসাৎ করে দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে, এ সামাজিক বিকাশ পৃথিবীর মধ্যবর্তী সমভাবাপন্ন অঞ্চলেই অধিকতর ঘটেছে। এ তুলনায় তৎসন্নিহিত অসমভাবাপন্ন উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলগুলোতে এর বিকাশ নিম্ন পর্যায়ের এবং সর্ব উত্তরে অত্যধিক শৈত্য ও সর্ব দক্ষিণে অত্যধিক উষ্ণতার জন্যও বিকাশ সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। বস্তুত মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতির অনুরূপ বিকাশের তারতম্যে প্রকৃতির এ প্রকার বিরূপতা ও সহায়তা এক প্রধান স্থান অধিকার করে আছে।

অবশ্য সভ্যতা সংস্কৃতির বিনির্মাণে এভাবে সামাজিক শক্তি ও প্রকৃতির উপস্থিতিকে প্রাধান্য দেয়া সত্ত্বেও ইবনে খালদুন অতীন্দ্রিয় শক্তিতে বিশ্বাস করেন। এরই ফলশ্রুতি হিসেবে তিনি একত্ববাদের ধারণাকে অত্যন্ত বলিষ্ঠ আকারে উপস্থাপন করেছেন এবং

যাদু, ইন্দ্রজাল ইত্যাদি সম্পর্কীয় ধ্যান-ধারণা পোষণেও তিনি নিস্পৃহ নন। অনেক ক্ষেত্রে নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তাঁকে এ সকল সংস্কার সম্পর্কে ইতিবাচক বক্তব্য রাখতে উৎসাহিত করেছে। সুতরাং সামগ্রিকভাবে ইবনে খালদুন তৎকালীন জীবন পরিবেশে আধ্যাত্মবাদ ও অতীন্দ্রিয় রহস্যবাদের যে ব্যাপক বিস্তার ঘটেছিল, তা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেননি।

তবু তাঁর আল-মুকাদ্দিমায় মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতি তথা ইতিহাসের যে বাস্তব পর্যালোচনা তিনি উপস্থিত করেছেন, তাতে এ প্রকার অতীন্দ্রিয় শক্তির প্রভাব একান্তই সীমিত। এজন্যই তিনি, এমন কি ইসলামের অভ্যুদয় ও বিকাশের পশ্চাতেও মানুষের সংঘবদ্ধ শক্তির সক্রিয়তাকে অনুধাবন করেছেন। তিনি তৎকালীন আরবের উপর 'মুজার' তথা কোরায়েশ গোত্রের অসামান্য প্রভাব এবং ইসলাম ধর্ম ও ইসলামী সাম্রাজ্য বিস্তারে সে প্রভাবের কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করে দেখেছেন। অনুরূপভাবে মানুষের সামাজিক বিকাশ ও শৃঙ্খলা বিধানের জন্য নবুয়তের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কীয় যে যুক্তি সাধারণভাবে ইসলামী জগতে বিদ্যমান, ইবনে খালদুন সে যুক্তির ধারাকে অস্বীকার করে একান্তভাবে মানুষের স্বভাবসুলত প্রয়োজন ও সংঘবদ্ধ সামাজিক শক্তির সক্রিয়তাকে সম্মুখে নিয়ে এসেছেন। চিন্তাশক্তির বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও মানুষ যে প্রাণিজগতেরই অধীন এবং এ বৈশিষ্ট্যের কল্যাণেই যে তথাকথিত ধর্মহীন জাতিগুলোর মধ্যেও সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছে এ তথ্যকেও তিনি তাঁর যুক্তির সমর্থনে উল্লেখ করেছেন। এমনকি যুদ্ধের জয়-পরাজয়ের মধ্যে অতীন্দ্রিয় শক্তির এ উপস্থিতির যে ধারণা সাধারণভাবে বিদ্যমান, তাকেও তিনি সফল বিশ্লেষণের মাধ্যমে মনস্তাত্ত্বিক যে সবলতা ও দুর্বলতা বলে আখ্যায়িত করেছেন। এখানে আরো উদাহরণ তাঁর আল-মুকাদ্দিমায় বিদ্যমান। এ সকল দিক থেকে লক্ষ করলে ইবনে খালদুনের এ প্রকার দৃষ্টিকোণকে একান্তই ঐহিকতা মণ্ডিত বলে মনে হবে; কিন্তু সামগ্রিকভাবে তা ঐহিকতার ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ নয়। যদ্দুর ধারণা করা যায়, ইবনে খালদুন মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকাশে অতীন্দ্রিয় শক্তির প্রভাবের গুণগত নয়, বরং পরিমাণগত সম্পর্ক স্থাপনের উপরই অধিকতর জোর দিয়েছেন।

এ কারণেই শেষ পর্যন্ত আমাদেরকে বলতে হয় যে, ইবনে খালদুনের মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়। সমগ্র প্রাণিজগতে তাঁর বিশিষ্টতার মৌল কারণ যে চিন্তাশক্তি, তা আল্লাহরই দান; অর্থাৎ আল্লাহই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। এজন্য অদ্ভুতভাবে আমরা লক্ষ করি গ্রিক ও ইসলামী দর্শনের এক সম্মিলিত প্রভাব ইবনে খালদুনের মানসপ্রক্রিয়াকে পরিচালিত করেছে এবং এর ফলে একদিকে তিনি যেমন সভ্যতা-সংস্কৃতিতে অতীন্দ্রিয়তার প্রায় সকল কুহেলিকা নস্যাৎ করতে এগিয়ে গেছেন,

অন্যদিকে তেমনি সামান্য পরিমাণে হলেও অতীন্দ্রিয় শক্তির অধীনতাপাশে আবদ্ধ করতে সচেষ্ট হয়েছেন। বস্তুত তাঁর ঐতিহাসিক দর্শনে এ প্রকার বৈপরীত্য বা সহাবস্থানের প্রচেষ্টা তাঁর জীবন পরিবেশেরই অনিবার্য ফলশ্রুতি। ইবনে খালদুন তাঁর বলিষ্ঠতা সত্ত্বেও একে সম্পূর্ণ অতিক্রম করতে পারেননি।

এভাবে অতীন্দ্রিয় শক্তির বদান্যতাধন্য মানুষ যখন তাদের চিন্তাশক্তির আকর্ষণে পরস্পরের সহায়তা লাভে এগিয়ে গেছে এবং সম্মিলিত প্রয়াসে পৃথিবীর বুকে অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছে, তখনই 'উমরান' বা সভ্যতার জন্ম হয়েছে। ইবনে খালদুন তাঁর আল-মুকাদ্দিমায় আলোচিত এ নতুন বিষয়ের নামকরণে এ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অবশ্য শব্দটি একমাত্র এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়নি; আল-মুকাদ্দিমার অন্যত্র তিনি একে 'জনবসতি' অর্থেও প্রয়োগ করেছেন। এ উমরান শব্দটির ধাতুগত অর্থ নির্মাণ করা; আবাদ করা। সুতরাং এ শব্দটি ইবনে খালদুনের বক্তব্য উপস্থাপনের লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। তদুপরি এর সঙ্গে ব্যবহৃত অন্য একটি শব্দের অর্থ মিলিয়ে নিলে তার বক্তব্যের সমগ্র ধারাটিই আমাদের সম্মুখে পরিস্ফুট হয়ে উঠে। সে শব্দটি হল, 'এজতেমাউল বশরী' বা মানব সমাজ। অর্থাৎ সহজ কথায় সভ্যতা-সংস্কৃতি বলতে যা বোঝায়, তা হল এ মানব সমাজেরই বিনির্মিত কীর্তিমালা।

কিন্তু মানব সমাজ বা এ জনশক্তির প্রচেষ্টা সত্ত্বেও উপরোক্ত কীর্তিমালা সর্বত্র সমানভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। অনুরূপ বৈচিত্র্যের কারণ হিসাবে প্রাকৃতিক প্রভাবের কথা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। ইবনে খালদুন এ প্রকার বহির্গত কারণ ছাড়াও সমাজশক্তির অন্তর্গত একটি কারণও অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। এ কারণটিকে তিনি নাম দিয়েছেন 'আসাবিয়্যা' বা গোত্রপ্রীতি। এ প্রীতির শক্তি যে পরিমাণে সংঘবদ্ধ ও সক্রিয় হয়েছে, সভ্যতা বিনির্মাণে তার প্রভাবও হয়েছে ততোই স্থায়ী ও দর্শনীয়। বস্তুত এ গোত্রপ্রীতি থেকেই মানুষের গোত্রবদ্ধ জীবনের বিকাশ এবং এটি মানুষের সমাজ বিকাশের প্রাথমিক স্তর। ইবনে খালদুন একেই 'বদোয়া' বা যাযাবরী জীবন বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ যাযাবর গোত্রশক্তিই আরো সংঘবদ্ধ হয়ে রাজ্য স্থাপন করেছে, নগর গড়ে তুলেছে এবং এরই ফলশ্রুতি হিসেবে নাগরিক সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে। এমন কি রাজ্য বিস্তারের তারতম্য ও তার স্থায়িত্বের বৈচিত্র্যের মধ্যেও ইবনে খালদুন এ গোত্রপ্রীতির অমোঘ ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া লক্ষ করেছেন। ফলত সমাজ বিকাশের সর্বত্র তিনি এ গোত্রশক্তির প্রবল প্রতাপ সম্পর্কে অতিমাত্রায় সোচ্চার।

ইবনে খালদুনের চতুর্দশ শতকীয় জীবন পরিবেশ হয়ত বা এ গোত্রপ্রীতির ধারণা সম্পর্কে সহনশীল মনোভাব পোষণ করত; হয়ত এর বাস্তবতা তারা জীবনের অনিবার্য

অভিজ্ঞতা থেকে স্বীকার করে নিয়েছিল। কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবকালে এবং পরবর্তী ইসলামী চিন্তাধারাতেও এ 'আসাবিয়্যা' বা গোত্রপ্রীতিকে সুনজরে দেখা হয়নি। ইসলাম এ যাযাবরী গোত্রপ্রীতির বাধা অপসারিত করেই সমগ্র আরবকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করতে চেয়েছিল। তখন এ সংঘটনশীল সামগ্রিক ঐক্যকে যারা গোত্রের প্রতি আসক্তির দ্বারা প্রতিহত করতে চেয়েছে, তারা তাদের এ প্রকার আচরণের জন্য নিন্দনীয় হয়েছে। এরই ফলে গোত্রপ্রীতি মাত্রই নিন্দার বিষয় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে ইসলামের সেই ধর্মীয় ঐক্য অটুট থাকেনি; খেলাফতের স্তর পেরিয়ে সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় ঘটেছে এবং গোত্রপ্রীতির অমোঘ প্রতিক্রিয়া তার প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারে লক্ষগোচর হয়ে উঠেছে। তথাপি ইসলামী চিন্তাধারায় গোত্রপ্রীতির এ শক্তিকে সর্বাংশে স্থান দেয়া হয়নি; শুধু ধর্মের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার অশুভ প্রভাবের সৃষ্টি না করলে তার উপস্থিতিকে মেনে নেয়া হয়েছে। সম্ভবত ইবনে খালদুনই সর্বপ্রথম গোত্রপ্রীতি সম্পর্কে এ প্রকার নেতিবাচক মনোভাব ত্যাগ করে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে তার ইতিবাচক অনিবার্য ভূমিকাকে তুলে ধরেছেন এবং এর মধ্য দিয়েই তিনি বলতে গেলে, সমাজ প্রগতির মৌলশক্তিকে আবিষ্কার করেছেন। বস্তুত এজন্যই তিনি বলতে পেরেছেন যে, শুধু রাজ্যবিস্তার নয়, ধর্ম তথা যে কোনো সংস্কারমূলক কার্যক্রমের জন্য এ গোত্রপ্রীতি বা সংঘবদ্ধ শক্তির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এর প্রমাণ হিসেবে ইতিহাস থেকে তিনি বহু ঘটনা ও দুর্ঘটনার উল্লেখ করেছেন।

তথাপি আমরা লক্ষ করব, এ প্রকার বলিষ্ঠ ইতিবাচক বক্তব্য তুলে ধরা সত্ত্বেও ইবনে খালদুন গোত্রপ্রীতির সংকীর্ণতাকে সর্বত্র পরিহার করে চলেছেন। বস্তুত সমাজ প্রগতির নিয়ামকরূপে ঐক্যবদ্ধ জনশক্তি সম্পর্কীয় তাঁর এ ধারণা এক সর্বজনীন প্রেক্ষাপটে বিন্যস্ত। এক্ষেত্রে তিনি ইসলামের সেই সত্যপ্রীতি ও সামাজিক ন্যায়কেই অধিকতর বাস্তবতার সাথে ভাষা দিয়েছেন। এজন্যই তিনি নিজে দক্ষিণ আরবের সাথে সম্পর্কযুক্ত 'হাযারামী' উপাধি ব্যবহার করলেও আরবীয় সাম্রাজ্যের বিস্তার ও সংস্কৃতি চেতনা সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্য বিচার করে যথাযথ মন্তব্য উপস্থাপনে দ্বিধান্বিত হননি। তাঁর এ প্রকার কঠোর মন্তব্যের প্রতিক্রিয়াও দেখা গেছে তাঁর জীবনে। এমনকি তাঁর জন্মভূমির বারবার জীবন পরিবেশে লালিত-পালিত হয়েও তিনি তাদের বীরত্বের যেমন প্রশংসা করেছেন, তেমনি তাদের সংকীর্ণতাকেও সমান বাস্তবতায় তুলে ধরেছেন। ইসলামী সংস্কৃতি বিনির্মাণে অনারব মনীষার অবদান যে সর্বাপেক্ষা অধিক এ সত্য উচ্চারণ করতেও তিনি ইতস্তত করেননি। এরই ফলে সভ্যতা-সংস্কৃতির নিয়ামক এ জনশক্তির অন্তর্গত দুর্বলতাকে তিনি আশ্চর্য নিপুনতায় ভাষা দিতে পেরেছেন।

বস্তুত সভ্যতার অগ্রগতি সাধনে নিয়োজিত জনশক্তির মধ্যে একান্ত স্বাভাবিক কারণেই অনুরূপ দুর্বলতার প্রকাশ ঘটে। যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোত্র মিলিত হয়ে জনশক্তি গড়ে তোলে, তাদের সকল অংশই সমমর্যাদায় নেতৃত্বদানের সুযোগ পায় না; বরং সেখানেও সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী গোত্রটিই এ দুর্লভ সম্মানে ভূষিত হয়। এভাবে তাদের দ্বারা সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ঘটলে সেই নেতৃত্বদানকারী গোত্রটির নেতৃস্থানীয় কোনো ব্যক্তি সিংহাসনে আরোহণ করেন। এ পর্যায়েই এ সম্মিলিত জনশক্তির মধ্যে প্রথম অনৈক্যের সূত্রপাত হয়। যে ব্যক্তি সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন, তিনি তার গোত্র বা সন্তান-সন্ততির জন্য সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হন এবং সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাকারী জনশক্তির অন্যান্য অংশগুলোকে পদানত করার কৌশল অবলম্বন করেন। ফলে রাজত্ব ও রাজকোষ সম্রাটের পারিবারিক সম্পত্তিতে পরিণত হয় এবং এ পারিবারিক স্বার্থসংরক্ষণের জন্য তিনি তার অধীনে নিয়োজিত কর্মচারী, সৈনিক ও সেবকের সমবায়ে একটি আজ্ঞাবহ জনশক্তি গড়ে তোলেন। এভাবে দুর্বলতার প্রাথমিক পর্যায় সমাপ্ত হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়ে আসে সাম্রাজ্যের অনুষঙ্গী বিলাসব্যসনের অনিবার্য প্রতিক্রিয়া। কারণ সম্রাট তার স্বার্থ সংরক্ষণের প্রয়োজনেই প্রজাসাধারণের মধ্যে সমীহের ভাব উদ্রেককারী জাঁকজমকের সৃষ্টি করতে বাধ্য হন। পরিণামে সম্রাটের সেবকবৃন্দ এবং প্রজাদের মধ্যেও এ জাঁকজমক তথা বিলাসিতার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে একদিকে যেমন জনশক্তির সংগ্রামী মনোভাব নষ্ট হয়, অন্যদিকে তেমনি জীবনযাপনে ব্যয়বাহুল্য ঘটে। আর এ ক্রমবর্ধমান ব্যয় সংকুলানের জন্য অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহের উপায় উদ্ভাবন করতে হয়। এক্ষেত্রে সম্রাটের পক্ষে অতিরিক্ত কর ধার্য করা ব্যতীত অন্য উপায় থাকে না। এখানেই দুর্বলতার তৃতীয় পর্যায়ের আরম্ভ এবং পরিণামে করভারে জর্জরিত কৃষক, শ্রমিক ও ব্যবসায়ীরা নিজ নিজ বৃত্তির প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ে। এভাবে সাম্রাজ্য তথা সভ্যতা নির্মাণকারী জনশক্তির পতন চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়।

ইবনে খালদুন সভ্যতা নির্মাণকারী জনশক্তির এ প্রকার উত্থান-পতনের আধার হিসাবে 'দওলত' বা সাম্রাজ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, সাম্রাজ্যের বিস্তার ও স্থায়িত্ব উক্ত জনশক্তির অনুপাতেই ঘটে থাকে এবং যে সমাজ যত শক্তিশালী ও দীর্ঘস্থায়ী হয়, সভ্যতা-সংস্কৃতির অগ্রগতি সাধনে তার অবদান ততই দর্শনীয় হয়ে উঠে। অবশ্য এতদসত্ত্বেও ইবনে খালদুন এ সাম্রাজ্যেরও বয়ঃসীমা নির্ধারণ করেছেন। তাঁর মতে যে কোনো সাম্রাজ্য সজীব সক্রিয় অবস্থায় তিন পুরুষের অধিক টিকে থাকে না; এরপরও তার স্থায়িত্ব অবক্ষয়ের অধীন জীবন্মুক্ত অবস্থার নামান্তর মাত্র। আধুনিক রাষ্ট্র বলতে যা বোঝায়, আল-মুকাদ্দিমায় তার কোনো সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই;

অনেক স্থলেই রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্য একই পরিণতির অধীন। ইবনে খালদুনের বিশ্লেষণে গোত্রপ্রীতির আকর্ষণে সংঘবদ্ধ জনশক্তিই ক্ষমতার উৎস এবং তাদের পতন ও পরিবর্তনে তাই সাম্রাজ্য ও রাষ্ট্রের পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে উঠে আর এ পরিবর্তনে শুধু সাম্রাজ্যের সীমা ও শক্তিমত্তারই পরিবর্তন ঘটে না; বরং তার চরিত্রও ভিন্নতর হয়ে দেখা দেয়। অবশ্য এ সত্ত্বেও ইবনে খালদুন সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের প্রশ্নটি বিবেচনা করেছেন এবং অত্যন্ত বাস্তব উদাহরণসহ বিজয়ী ও বিজিতের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন।

এভাবে ইবনে খালদুনের মানুষ আদিম যাযাবর গোত্রজীবন থেকে যাত্রা শুরু করে পরিণামে নাগরিক সভ্যতার রূপকার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ দীর্ঘ যাত্রাপথে শ্রমই হল তার মূল পুঁজি এবং এ শ্রমকে সে কখনো অস্ত্রে, কখনো পাত্রে, কখনো উৎপাদনে ব্যবহার করে এগিয়ে এসেছে। বস্তুত এ শ্রম দিয়ে যেমন সে তার জীবনের মৌলিক প্রয়োজন মিটিয়েছে তেমনি উদ্বৃত্ত শ্রমের সাহায্যে গড়ে তুলেছে বিরাট নগর, বিলাসী শিল্পকলা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র সম্ভার। শ্রমের এ প্রকার নিয়োগ ও প্রাপ্তির স্তর পরম্পরা বিশ্লেষণে ইবনে খালদুন আশ্চর্যভাবে অতীন্দ্রিয়তার প্রভাব মুক্ত। এ কারণেই তিনি তৎকালে প্রচলিত শ্রমবিমুখ জীবিকা অর্জনের বিভিন্ন পদ্ধতিকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছেন। তাঁর এ আক্রমণ থেকে তাই জ্যোতিষশাস্ত্র, কিমিয়াশাস্ত্র, গুপ্তধন সন্ধান ও ভাগ্য গণনার বিচিত্র নিয়ম-কানুন কোনো কিছুই রেহাই পায়নি। তিনি সোজা ভাষায় বলেছেন যে, যারা পরিশ্রমের দ্বারা জীবিকা অর্জনের সহজ পথ ত্যাগ করেছে তারাই এ সকল শ্রমবিমুখ শাস্ত্রাদির উপর নির্ভর করে প্রতারণার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। অবশ্য পরিণামে তারা নিজেরাই প্রতারিত হয়েছে। কারণ সভ্যতার ভিত্তি প্রতারণা নয় পরিশ্রম। এজন্যই ইবনে খালদুনের মতে শ্রমের প্রতি অবহেলা অন্যায় এবং শ্রমের যথাযথ মূল্য না দিয়ে তার ফল ভোগ করা সর্বাপেক্ষা ঘৃণা অবিচার। ফলত এ ধরনের অন্যায় অবিচারের মাত্রাধিক্য থেকেই সভ্যতার অগ্রগতি ব্যাহত হয় ও তার অবলুপ্তি অনিবার্য হয়ে উঠে।

ইবনে খালদুনের মতে নাগরিক সভ্যতাই সভ্যতার শেষ পর্যায়। কারণ জীবন বিকাশের স্বাভাবিক আকর্ষণে মানুষের অগ্রগতি এখানে এসেই স্থিতি লাভ করে এবং পুনরায় সে তার পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তন করে। এ প্রকার চক্রবৎ পরিবর্তনের প্রথম পর্যায়ে শ্রমের প্রতি আগ্রহ এবং শেষ পর্যায়ে তৎপ্রতি অবহেলা বিরাজ করে। ইবনে খালদুন এ উভয় আচরণের স্বাভাবিক কার্যকারণ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, এছাড়া মানুষের গত্যন্তর নেই। মানুষের জীবনের যেমন বিকাশ ও সমাপ্তি আছে, তেমনি তার প্রচেষ্টারও বিকাশ ও সমাপ্তি বিদ্যমান।

আমরা পূর্বেও উল্লেখ করেছি যে, আমাদের এ প্রকার সংক্ষিপ্ত আলোচনায় ইবনে খালদুনের সামগ্রিক মূল্যায়ন সম্ভব নয়। আমরা শুধু তাঁর ইতিহাসের তথ্যাদি বিশ্লেষণে উপস্থাপিত সভ্যতা-সংস্কৃতি বিনির্মাণের মূল সূত্রটির উপর আলোকপাত করতে চেষ্টা করেছি এবং আমরা লক্ষ করেছি যে, তাঁর অন্তর্দৃষ্টি অত্যন্ত অদ্ভুতভাবে সভ্যতা-সংস্কৃতি তথা ইতিহাসের মূল নিয়ামক শক্তিকে অবলোকন করতে সমর্থ হয়েছে। আধুনিক দৃষ্টিতে তাঁর এ প্রকার অন্তর্দৃষ্টি ও বিশ্লেষণ যত প্রাথমিক স্তরেরই হোক না কেন, চতুর্দশ শতাব্দীর জীবন পরিবেশে এ ছিল এক বিপ্লবাত্মক বিষয়। এজন্যই তিনি লিখেছেন,

> নানা কারণে এটা একটি সম্পূর্ণ নতুন বিষয়। আমি এ বিষয়ের আলোচনা কোথাও খুঁজে পাইনি। জানি না, এটা কি তাঁদের উদাসীনতার ফল কিংবা এ ব্যাপারে তাদের কোনো ধারণাই ছিল না; অথবা হয়ত তাঁরা এ বিষয় নিয়ে প্রচুর লিখেছেন কিন্তু আমাদের নিকট তা এসে পৌছায়নি। কারণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয়াদির সীমা-পরিসীমা নেই এবং মানব সমাজে জ্ঞানীগুণীর সংখ্যাও অপরিমিত। আমরা উত্তরাধিকার হিসেবে যা পেয়েছি, অপ্রাপ্তির পরিমাণ তদপেক্ষা অনেক বেশি। পারসিকদের সেই জ্ঞান কোথায় যা পারস্য বিজয়কালে হজরত উমর রা. নিশ্চিহ্ন করে দিতে বলেছিলেন! কোথায় কেলাদিয়ান, সিরিয়ান ও ব্যাবিলনবাসীদের জ্ঞানের ঐতিহ্য! তাদের মধ্যে তার যে নিদর্শন বিদ্যমান ছিল, যে ফলশ্রুতি ঘটেছিল, তা কোথায় বিলুপ্ত হল! কোথায় গেল তাদের কিবতী ও পূর্ববর্তীদের জ্ঞানের ঐশ্বর্য! আমাদের নিকট শুধু একটি জাতির জ্ঞান-গুণই এসে পৌঁছেছে, তাঁরা হলেন গ্রিক। এটাও সম্ভব হয়েছে সম্রাট মামুনের জন্য। তিনি কষ্ট স্বীকার করে, বহু লোককে দিয়ে অনুবাদ করিয়ে এবং বহুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে তা সম্ভব করে তুলেছেন। কিন্তু এ একটি জাতি ব্যতীত অন্যান্য জাতির জ্ঞানের কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না।"

এ উদ্ধৃতি থেকে আমরা ইবনে খালদুনের জ্ঞানস্পৃহার ব্যাপকতা সম্পর্কে যেমন অবহিত হতে পারি , তেমনি তাঁর এ 'নতুন বিষয়'-এর পরিবেশ সম্পর্কেও আমাদের ধারণা করে নিতে অসুবিধা হয় না। সম্ভবত এ কারণেই তৎকালীন যুগমানস তাঁর এ নতুন বিষয়ে বিন্যস্ত অন্তর্দৃষ্টির সম্যক গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেননি।

ইবনে খালদুন মিসরে জীবনের প্রায় একতৃতীয়াংশ সময় কাটিয়েছেন। এ সময়ে তিনি শিক্ষকতার সুযোগ পেয়েছিলেন। এর পূর্বেও তিউনিসে ও অন্যত্র তিনি এ কাজে ব্যাপৃত হয়েছেন। তাঁর এ প্রকার শিক্ষকতায় যত সীমাবদ্ধতাই থাক না কেন, নিশ্চয়ই তিনি তাঁর এ নতুন বিষয় সম্পর্কে আলোচনা অব্যাহত রেখেছিলেন। মিসরে তাঁর দুজন শিষ্য ইবনে হাজার ও আল মাকরিজী পরবর্তীকালে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁদের শিষ্য আসসাখাবী ও ইবনে খালদুনের স্বদেশের আল-মাক্কারী সকলেই ইতিহাস চর্চায় নিয়োজিত ছিলেন। তাঁরা সকলেই ইবনে খালদুনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন ও তাঁর ঋণও স্বীকার করেছেন; কিন্তু গুরুর এ কালজয়ী অন্তর্দৃষ্টির কোন অনুসরণ বা বিস্তার তাঁদের মধ্যে লক্ষ করা যায় না। এর কারণ আমরা তৎকালীন যুগ পরিবেশের মধ্যেই খুঁজে পাব। জীবন বিমুখী যে অবক্ষয়ী চিন্তাধারা সে কালের গণমানসকে আবৃত করে রেখেছিল, তা থেকে এ সকল জ্ঞানীগুণী কেউই মুক্ত হতে পারেননি। আমরা পূর্বেও উল্লেখ করেছি যে, স্বয়ং ইবনে খালদুনও এর থেকে মুক্ত ছিলেন না। এ কারণেই তাঁর প্রায় শতাব্দীকাল পরবর্তী ইতালীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ম্যাকিয়াভেলীর 'প্রিন্স' গ্রন্থে সমকালীন জীবন পরিবেশের যে বাস্তব বিবরণ আমরা দেখতে পাই ইবনে খালদুনের আল-মুকাদ্দিমায় অনুরূপ কোনো বাস্তবতার পরিচয় নেই। সমকালীন রাজনীতিতে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁর অভিজ্ঞতাও ছিল প্রচুর; কিন্তু কী ইতিহাসের তথ্য বিচার, কী রাষ্ট্রীয় উত্থান-পতনের কার্যকারণ বিশ্লেষণে; কোথাও তিনি তাঁর এ অভিজ্ঞতাকে ভাষা দেননি। বরং তাঁর অধিকাংশ উদাহরণ ও দৃষ্টান্তই অতীতের ব্যাপার। সুতরাং তার উত্তরসূরি শিষ্য-প্রশিষ্যরা যে আরো বেশি মাত্রায় এ প্রকার সীমাবদ্ধতার দ্বারা পীড়িত হয়েছিলেন তা বলাই বাহুল্য।

অবশ্য একথা সত্য যে, আল-মুকাদ্দিমার সঙ্গে প্রিন্সের কোনো তুলনাই চলে না। প্রিন্স যতই বাস্তবানুগ হোক না কেন, আল-মুকাদ্দিমার বিস্তৃত পরিসর তার মধ্যে নেই। সে একটি মাত্র বিষয় রাজনীতি নিয়েই তার আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রেখেছে। এমন কি এ নির্দিষ্ট বিষয়েও প্রিন্সের বর্ণনার দ্বারা বিশেষ করে শাসকের গুণাবলি সম্পর্কীয় 'মারি অরি পারি যে কৌশলে'র কূটনীতি আল-মুকাদ্দিমায় নেই। এজন্য অনেক সমালোচক রহস্য করে বলেছেন যে, প্রিন্সের গুণাবলি ইবনে খালদুনের জীবনে কিছুটা থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু তাঁর অবসান এ থেকে মুক্ত। বস্তুত প্রিন্স অপেক্ষা আল-মুকাদ্দিমার বিষয়বিন্যাস আরো ব্যাপক আরো সুদূরপ্রসারী। এ প্রসঙ্গে আমরা পূর্বেও উল্লেখ করেছি যে, ইবনে খালদুন সভ্যতা-সংস্কৃতির তৎকালে প্রচলিত, সর্বপ্রকার উপাদান সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করেছেন। এক্ষেত্রে কোনো বিশেষ বিষয়েই তাঁর মৌলিক কোন সংযোজন নেই; বরং তিনি যেখানে বা পেয়েছেন সযত্নে কুড়িয়ে এনে তাঁর অর্ন্তদৃষ্টিকে ফুটিয়ে তুলতে ব্যবহার করেছেন। অনেকস্থলে বিষয়টির উপস্থিতিই তাঁর বক্তব্য পরিস্ফুট করে তুলেছে। অনেক স্থলে তিনি একটি বাক্য বা কোরানের একটি আয়াত ব্যবহার করে তীর্যকভাবে তাঁর উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ করেছেন। বস্তুত এভাবে তাঁর উদ্দেশ্য অনুযায়ী বিচিত্র বিষয়ের সংগ্রহ ও বিন্যাসে ইবনে খালদুন আশ্চর্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

তবু এর ফলেই তাঁর আল-মুকাদ্দিমায় আমরা এমন কিছু ত্রুটির সন্ধান পাই, যা অনিবার্যভাবে এ বিচিত্র বিষয়ের অনুষঙ্গী হয়ে এতে প্রবেশ করেছে। প্রথমেই যে

ত্রুটিটি যে কোন সচেতন পাঠকের দৃষ্টিগোচর হয় তা হল, ইবনে খালদুন বহুবারই একই বিষয়ের বর্ণনাগত পুনরাবৃত্তি করেছেন। উদাহরণস্বপ বিচিত্র জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলাকে তিনি একবার শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে এবং পুনর্বার জীবিকার মাধ্যম হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এ ধরনের পুনরাবৃত্তি প্রাসঙ্গিক বিষয়ের জন্য প্রয়োজনীয় হলেও আধুনিক পাঠকের নিকট আকর্ষণীয় বলে মনে হয় না। বরং একথাই মনে হবে যে, ইবনে খালদুনের এ ধরনের পুনরাবৃত্তিকে সঙ্কুচিত করে তাঁর আল-মুকাদ্দিমার বিস্তৃতি প্রায় অর্ধেক কমিয়ে ফেলা যায়। কিন্তু পাঠক যদি চতুর্দশ শতকীয় বিষয় বর্ণনার ধারা ও শিক্ষাদান প্রণালীর প্রতি দৃষ্টি দেন, তাহলে এ প্রকার পুনরাবৃত্তিমূলক বর্ণনাকে অনায়াসে সহ্য করে নিতে পারবেন। বস্তুত আল-মুকাদ্দিমার বর্ণনা বক্তৃতার ভঙ্গিতে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বিস্তারিত হয়েছে। এ কারণেই এর ভাষা যথাসম্ভব বিশ্লেষণ বাহুল্যবর্জিত সরলতায় বিশিষ্ট। তাঁর আকর্ষণীয় বাগ্মিতা ভাষার এ সারল্যকে নিয়ন্ত্রিত করেছে।

ইবনে খালদুন তার আল-মুকাদ্দিমায় বিচিত্র বিষয় সংগ্রহ করলেও যেখানে যা পেয়েছেন, হুবহু তাই গ্রহণ করেননি; বরং যথাসম্ভব সংক্ষেপে নিজের প্রয়োজন অনুসারে নিজের ভাষাতেই তা বিন্যস্ত করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে তাঁর এ প্রকার সংক্ষিপ্তকরণ কিছুটা দুর্বোধ্যতা ও আড়ষ্টতার সৃষ্টি করেছে। অন্যদিকে বিষয়গত পরিভাষার ক্ষেত্রেও সর্বত্র সমতা রক্ষা হয়নি; এমনকি বর্ণনার ভাষাতেও এরই ফলে বিষয়ানুসারী বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়েছে। যে কোন সচেতন পাঠক তাঁর সমগ্র আল-মুকাদ্দিমা পাঠ করে একথা অবশ্যই স্বীকার করবেন যে, ইবনে খালদুনের মূল ভূমিকাটিই সর্ববিষয়ে এর শ্রেষ্ঠ অংশ। বস্তুত এ ভূমিকাতে ইবনে খালদুন তার ভাষাজ্ঞান, বর্ণনাশৈলী ও যুক্তি বিন্যাসের এক অপূর্ব নিদর্শন তুলে ধরেছেন। তাঁর আল-মুকাদ্দিমার অন্যান্য অংশ সে তুলনায় অনেকখানি নিষ্প্রভ। এর কারণও আমরা পর্বেই উল্লেখ করেছি; সংগৃহীত বিষয়ের অনুসারী হয়েই এ সকল ত্রুটি আল-মুকাদ্দিমায় প্রবেশ করেছে। পরিবেশের ন্যায় পরিবেশনের এ বাধ্যবাধকতা থেকেও ইবনে খালদুন নিজকে মুক্ত করতে সক্ষম হননি।

অবশ্য তাঁর বিরাট অবদানের তুলনায় এ সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি একান্তই নগণ্য। সূর্যের ন্যায় তাঁর অন্তর্দৃষ্টির প্রখর ঔজ্জ্বল্য তাঁর সমস্ত কলঙ্ক রেখাকে অবলীলায় নিশ্চিহ্ন করে দেয়। এ কারণেই ইবনে খালদুন আজ সারা বিশ্বে ঐতিহাসিক দর্শন ও সমাজতত্ত্বের অবিসংবাদিত জনকরূপে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। পাশ্চাত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ও সমাজতত্ত্ববিদ আর্নল্ড টোয়েনবি বলেছেন যে, ইবনে খালদুনের ঐতিহাসিক দর্শন জ্ঞানের ইতিহাসে আজ পর্যন্ত অনতিক্রান্ত সৃষ্টির মর্যাদায় বিভূষিত

হয়ে আছে। জর্জ মারটনও বলেছেন যে, কেবলমাত্র মধ্য যুগেই নয়, প্রাচীন ঐতিহাসিকদের সময় থেকে ম্যাকিয়াভেলী পর্যন্ত ইতিহাসতত্ত্ব ও মানবিক অভিজ্ঞতার দর্শনের রাজ্যে ইবনে খালদুনের সমকক্ষ আর কেউ জন্মগ্রহণ করেননি। বলা বাহুল্য এ স্বীকৃতি, এ সাধুবাদ ইবনে খালদুনের যথার্থই প্রাপ্য। তবু একথা উল্লেখের প্রয়োজন আছে যে, যতদিন পর্যন্ত আমরা আমাদের ইতিহাস চেতনায় তাঁর অন্তর্দৃষ্টিকে বিধৃত করতে না পারব, যতদিন একান্ত বাস্তব প্রয়োজনে তাঁর প্রগতি ও প্রতিক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করে দেখতে না পরব, ততদিন তাঁর যথার্থ মূল্যমান আমাদের পক্ষে অনুধাবন করা হবে না।

[গোলাম সামদানী কোরায়শী অনূদিত ও দিব্য প্রকাশ, ঢাকা প্রকাশিত ইবনে খালদুনের 'আল-মুকাদ্দিমা' ১ম খণ্ড (৩য় মুদ্রণ, ২০১৫) থেকে সংগৃহীত; পৃ. ৪৮-৫৭]